কালাগুরু

BANGLADARSHAN.COM

সুবোধ ঘোষ

॥কালাগুরু॥

কত মহকুমা অফিসার এল আর গেল, কিন্তু মিস্টার টেনব্রুকের মত কেউ নয়। ছোট শহর সেখপুরার হৃদয় তিনি প্রায় জয় করে বসেছেন। একা উদ্যোগী হয়ে, চাঁদা তুলে আর গ্র্যান্ট বাগিয়ে হাসপাতালটাকে তিনিই মন্দদশা থেকে উদ্ধার করেছেন। পদগৌরবে তিনি মহীরুহ সমান, কিন্তু ব্যবহারে তৃণাদপি সুনীচ। অতি অসাময়িক মিশুক প্রকৃতির লোক। আজ সন্ধ্যায় তাঁকে দেখা যায়, দর্জিপাড়ার মিলাদে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে আছেন, কাল সন্ধ্যায় হরিসভার প্রাঙ্গণে। জুতো জোড়া দরজার বাইরে খুলে রেখে আসতে কখনও ভুল করেন না। কোন মতেই তাঁর নিষ্ঠার খুঁত ধরা যায় না।

মিস্টার জেরোম টি এল টেনব্রুক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একটি নতুন নক্ষত্র। আর আলোটাও একেবারে নতুন ধরনের। তাছাড়া তিনি একজন ইণ্ডোলজিস্ট। নিউ ইয়র্কের স্যামসন ইনষ্টিটিউটের মুখপত্রে তাঁর গবেষণার বিবরণ নিয়মিতভাবে ছাপা হয়। তাঁর ভারতী বিদ্যার গভীরতা পশ্চিমা পণ্ডিতেরা প্রথম জানতে পারেন। সেই বিখ্যাত থীসিস থেকে—ঋগ্বেদের প্যান-থীইজ্‌মে কেলটীয় চারণ সঙ্গীতের প্রভাব। এক দুরূহ সিদ্ধান্তকে প্রমাণে-অনুমানে প্রতিপন্ন করতে হলে যে-পরিমাণ সপ্রতিভ যোগ্যতা থাকা দরকার, টেনব্রুক সাহেবের সে-সবই আছে। অর্থাৎ তিনি দেবনাগরী লিপি পড়তে পারেন, বাংলা লিখতে পারেন ও হিন্দীতে বক্তৃতা দিতে পারেন। তাঁর দাদু ক্যাপ্টেন টেনব্রুক ছিলেন বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্ক টোয়েনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধে নানা নিগূঢ় তথ্য তিনি দাদুর কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন। আজকাল ইণ্ডিয়াতে একটা জাতিবাদী অনুদারতার মালিন্য দেখা দিয়েছে, নইলে টেনব্রুকের প্রতিভার এই দিকটাও লোকে চোখে দেখতে পেত। জগদীশপুর থেকে বদলী হবার সময় বিদায়-সভায় বক্তৃতাক্রমে তিনি তাঁর মনের কথা অকপটে খুলে বলেছিলেন—"আমার বুঝতে ভুল হতে পারে, হয়তো আমার জানার মধ্যে ভুল আছে, কিন্তু ইণ্ডিয়ার আত্মাটিকে আমি একরকম চিনেছি। চিরধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মত ভারতের সেই আত্মাটিকে আমি ভালবাসি।"

BANGLADARSHAN.COM

অনেকদিন আগে রাজগীরের মাঠে একটা পাথরের ধূপদান কুড়িয়ে পেয়েছিলেন টেনব্রুক। এই ধূপদানটা একটা লালচে বেলেপাথরের ফোটা পদ্মফুলের মত। ষ্টুডিয়োতে একটা লম্বা তেপায়া স্ট্যাণ্ডের ওপর ধূপদানটা বসানো থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় বেয়ারা এসে ধূপদানের বুকে প্রায় আধমুঠো কালাগুরু পুড়তে দেয়। টেনব্রুক বলেন—এর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাচ্য সৌগন্ধের যাদু লুকিয়ে আছে।

বিদ্যাপীঠের ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। আচমকা একটা হুডখোলা টুরার সড়ক ছেড়ে একেবারে সশব্দে দৌড়ে মাঠের গায়ে লাগলো। দুষ্টু ছেলের মতই উৎসাহে চঞ্চল টেনব্রুক গাড়ী থেকে একলাফে মাঠে নেমে পড়লেন। ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে লেগে গেলেন।

খেলার মাষ্টার অনাদিবাবুর বুকে দুরু-দুরু সুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য হুইসিল বাজানো ভুলে গেলেন। তবু বারবার ডেভিড হেয়ারের কথা স্মরণ করে কোনমতে নিজেকে ধীরে ধীরে আশ্বস্ত করে আনলেন। আবার আগের মত খেলা জমে উঠলো।

কিন্তু করালীবাবুর ছেলেটা, ঐ বলাই হলো এক নম্বরের বেয়াড়া। বল ছেড়ে দিয়ে যেভাবে পেছনে থেকে সাহেবকে লেঙ্গি মারবার চেষ্টা করছে, ঘন ঘন ফাউল হেঁকেও ওকে দুরস্ত করা যাচ্ছে না। অনাদি মাষ্টারের মনের শান্তি ক্ষণে ক্ষণে খুঁচিয়ে নষ্ট করছিল বলাই–হিতাহিত ভাবনা নেই ছেলেটার।

খেলার শেষে টেনব্রুক সাহেব কিন্তু সব ছেলেদের মধ্যে বেছে বেছে বলাইকেই পিঠ চাপ্‌ড়ে বাহ্‌বা দিয়ে গেলেন। সাহেব চলে যাবার পর অনাদি মাষ্টার তবু বলাইকে আর একবার ভাল করে ধমকাতে ছাড়লেন না– ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম গোঁয়ারের মত খেলবে না।

অনাদি মাষ্টারের মন কেন জানি ভরসা পাচ্ছিল না।

টেনব্রুক সাহেবকে লোকে আরও ভাল করে চিনতে পারলো সেইদিন–দরবার দিবসের অনুষ্ঠানে। ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বার লাইব্রেরী ও তালুকদার সমিতির প্রত্যেক সভা, তাছাড়া যত কেরাণী বেনিয়া পাদরী, সকলেই টেনব্রুক সাহেবের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

BANGLADARSHAN.COM

টেনব্রুক সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন–"আমি প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারীকে এবং বিশেষ করে পুলিশকে একটি সত্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই সত্য হলো, তাঁরা যেন কখনো না মনে করেন যে তাঁরা জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা। তাঁরা পাব্লিকের সেবক মাত্র। পুলিশ যেন সর্বদা মনে রাখে যে তারা মস্তিষ্ক নয়– তারা দুটি হাত মাত্র। তাদের কর্তব্য শুধু অর্ডার পালন করা। আজকের সুপ্রভাতে আমার মনে কেন জানি একটা আবছা আশঙ্কা থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে, ভারতের আকাশে অলক্ষ্যে কোথায় বোধহয় এক টুকরো অবাঞ্ছিত বেদনার মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। বোধহয় একটা পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। আমাদের এই ছোট সুখী শহরেও ঝড় দেখা দিতে পারে। সেই পরীক্ষায় পাব্লিক ও গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক যেন অনর্থক তিক্ত না হয়ে ওঠে। সেইজন্য আমি আগে থেকেই সবার আগে পুলিশকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্কবাণী শুনিয়ে দিতে চাই। পুলিশ যদি আইনের মাত্রা লঙ্ঘন করে, তবে সেটাও রাজদ্রোহ বলে গণ্য করতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হবে, তার শাস্তিও আছে।"

বক্তৃতার সময় সকলেই একটা তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে ডি এস পি রায়বাহাদুর জানকী প্রসাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। পুলিশ-প্রধান জানকীপ্রসাদের মুখে কিন্তু কোন ভাববৈকল্য দেখা দেয় নি। লড়াইয়ের ঘোড়ার মত তাঁর কপালের মোটা মোটা শিরাগুলি এক অবধারিত আশ্বাসে শান্ত গর্বে দপ্‌ দপ্‌ করছিল–যেমন নির্বিকার, তেমনি শান্ত আর তেমনি স্পষ্ট।

বিদ্যাপিঠের খেলার মাঠের মতই সেখপুরের জীবন হাসিখুসীতে চঞ্চল হয়েছিল। টেনব্রুক সাহেব রোজ না হোক্ সপ্তাহে তিনটে দিন অন্ততঃ খেলতে আসেন। অনাদি মাষ্টার একটা আশঙ্কা থেকে রেহাই পেয়েছেন। বলাই আর টেনব্রুক সাহেব এই সাইডে খেলে। দু'জনের মধ্যে আর সংঘর্ষের কোন অবকাশ নেই। ছেলেগুলি সত্যি সত্যি খেলার ব্যাপার যেন টেনব্রুকের ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল। প্রতি বৈকালে ওরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় সাহেবের গাড়ীর শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

তবু মেঘ দেখা দিল। সেখপুরা শহরকে সত্যিই যেন একটা ঝড়ের আবেগ চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। লোকাল বোর্ডের একুশ জন সদস্য ইস্তফা দিল। তিনটে দিন হরতাল হলো। রাজগঞ্জ কোলিয়ারিতে সুরু হলো ধর্মঘট! জৈন ধর্ম্মশালার আঙ্গিনায় একটা জনসভাও হয়ে গেল। একটা হাজার মানুষের শোভাযাত্রা স্বরাজ পতাকা নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে গেল।

মিষ্টার টেনব্রুক অবিচল ছিলেন। একটিও লোক গ্রেপ্তার হলো না, একশো চুয়াল্লিশ জারি ক'রে কোন ঢোলের শব্দ বাজলো না। পুলিশ শুধু সেজেগুজে কোতোয়ালীতে বসে থাকে। বাইরে যাবার কোন প্রয়োজন হয় না– টেনব্রুকের কড়া নির্দ্দেশ।

সূর্য্যকুণ্ডের জলের মত সেখপুরা যেন তিনটি মাস ধরে উত্তেজনায় ফুটতে লাগলো। তার মধ্যে মিষ্টার টেনব্রুক শুধু একটি কাজ করলেন। দিকে দিকে ইস্তাহার ছড়িয়ে দিলেন "আমার প্রিয় সেখপুরার পাব্লিকের কাছে এই আবেদন করতে চাই যে, যে কোন বিবাদ বা প্রতিবাদ হোক্, আলোচনা করে তার নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সভ্যতার চরম উন্নতি হলো ডেমোক্রেসী, ডেমোক্রেসীর প্রাণ হলো ডিসিপ্লিন। সেই ডিসিপ্লিন যেন নষ্ট না হয়।"

BANGLADARSHAN.COM

ঘটনাগুলি যেন নিজের উত্তেজনাতে অবসন্ন হয়ে ক্রমে থিতিয়ে গেল। কোথাও প্রতিহত হলো না বলেই বোধ হয় ফুরিয়ে গেল। টেনব্রুক তাঁর নৈতিক এক্সপেরিমেণ্টের এই অভাবিত সাফল্যে খুশীতে বিভোর হয়ে রইলেন। শহরের নানা সম্প্রদায়ের দশজন বেসরকারী এবং পাঁচজন সরকারী প্রধানকে ডেকে নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করলেন। কে যেন পরামর্শ দিল, ডি-এস-পি'কে কমিটির মধ্যে গ্রহণ করা হোক্। শুদ্ধাদর্শী টেনব্রুক শুচিবাতিকের মত নাক কুঁচকে আপত্তি জানালেন–না, কোনমতেই নয়।

শুধু থামছে না প্রভাত ফেরীর গান। ঝড়টা যেন পালিয়ে গেছে শুধু ভৈরবী সুরের একটা আক্রোশ রেখে দিয়ে। সেখপুরার নিথর সুপ্তির মধ্যে প্রতিদিন শেষ রাত্রে কারা যেন পথে পথে গান গেয়ে চলে যায়। টেনব্রুক দিন গুনছিলেন, এই চৌরচপলতাও ক্রমে শান্ত হয়ে আসবে।

অনেকদিন গোনা হয়ে গেল। টেনব্রুক তবু ধৈর্য্য ও বিশ্বাসে অটল ছিলেন। শান্তি কমিটি কত গোপন খবর এনে দিল, তবু প্রভাতফেরীর রহস্যটা আজও ঘুচলো না। কেউ বলতে পারে না, কারা গান গায়, কোথা থেকে আসে এবং কোথায় চলে যায়? মাঝ রাত্রে শহরের সব পাড়ার কত ছেলেবুড়ো উঠে বসে থাকে। প্রতীক্ষায় নিঝুম

মুহূর্তগুলি পার হতে থাকে। হতাশ হয়ে ভাবে—আজ বুঝি আর গানটা এল না। সেই আনমনা অবকাশের মধ্যে চকিতে বাইরের পথে গানের শব্দ উতরোল হয়ে ওঠে। দরজা খুলে বাইরে আসতে আসতেই মিলিয়ে যায়—কাউকে দেখা যায় না।

এ গান কখনও বন্ধ হবে না। শহরে একটা কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে।—এই গয়ারোড ধরে যদি মাইল খানেক পশ্চিমে এগিয়ে যাও, তবে প্রথমে পড়বে ডুমরিচকের ডাকবাংলা। সেখান থেকে ডাইনে বেঁকে আরও পাঁচ ক্রোশ। পুরনো কারবালা পার হয়ে একটা বহেড়ার জঙ্গল, তার উত্তর ঘেঁসে একটা নদী। নদীর একপাশে একটা প্রকাণ্ড বিপুল গাছ হেলে আছে। অন্য পাশে পি ডব্লুউ ডির সড়ক।

—হাঁ আছে। সবাই জানে, সার্ভিস বাসগুলি গিরিডির পথে মোর ফেরবার আগে এইখানে একটু জিরিয়ে নেয়, রেডিয়েটারে নতুন জল ঢালে। একটা চৌকীদারী ফাঁড়ি আছে সেখানে। পিপুলতলার একটা গাঁথুনির ওপর দ্রাঘিমার নম্বর চিহ্নিত আছে।

শোকাবহ বেদনায় কাহিনীটা আরো করুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।—সেই সন সাতান্নের গদরে ঠিক ঐ জায়টিতে একশো জন ছত্রী সেপাইয়ের প্রাণ গিয়েছিল। এই কার্ণাইল সাহেব ঐ পিপুলতলায় তোপ বসিয়ে বন্দী ছত্রীদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

আরও ঘনিষ্ট হয়ে কাহিনীটা সবার কানে কানে চুপি চুপি ফিস্‌ফিস্‌ করে যায়।—গানটা সত্যিই তো মানুষের গলার গান নয়—প্রভাতফেরীটেরী নয়। একটা শব্দ-মরীচিকা মাত্র। গয়ারোডের দিক থেকেই শব্দটা প্রথমে শোনা যায়। সারারাত ধরে এগিয়ে আসে, তারপর শহরে ঢোকে এবং ভোর না হতেই সরে পড়ে।

মিষ্টার টেনব্রুকও কাহিনীটা শুনলেন। বিভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত শান্তি কমিটিতে তিনিই আশ্বাস দিয়ে জানালেন—ঘাব্‌ড়াবার কিছু নেই। এইসব প্রেতরাগিণী আর কিম্বদন্তীর সঙ্গে লড়বার কায়দাও আমি জানি।

অঘ্রাণের রাত্রি ভোর হয়ে আসে। মোড়ের মাথায় মিউনিসিপ্যাল ল্যাম্পপোষ্টের মাথাটা তখনো জ্বলছে। শিশির-ভেজা সড়কটা নেতিয়ে পড়ে আছে অলসভাবে। শালের ডালপালাগুলি এক একটা কুয়াসার স্তবক আঁকড়ে নিঝুম হয়ে আছে। সেই ফিকে অন্ধকার আর মূক নিসর্গের মাঝখানে কাছারী রোডের ধারে একটি গাছতলায় মিষ্টার টেনব্রুক যেন গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এক অবাস্তব দেশের সেনাবারিকে সতর্ক শান্ত্রীর মত।

এতক্ষণে শুনতে পাওয়া গেল। মন্থর বাতাসের গায়ে দুরাগত সেই অদ্ভুত সুরের শিহর এসে লাগছে। গানের ভাষা স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। ছোট ছোট শব্দময় স্রোত একসঙ্গে মিশে গিয়ে যেন এক সুরপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। তারা এগিয়ে আসছে।

—নয়া জমানার সূর্য্য উঠেছে। জাগো আমার হিন্দুস্থানী ভাই আর বহিন। জেগে উঠে এই নতুন রশ্মি সাগ্রহে পান কর।

গাইতে গাইতে প্রভাতফেরীর দলটা সামনে এসে পড়লো। ছোট ছোট কতগুলি গীতপ্রাণ অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি, চেনবার জো নেই। মিষ্টার টেনব্রুক স্তব্ধ হয়ে নিশ্বাস রুখে শুনছিলেন। কতগুলি কচি কিশোর মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর—তার হর্ষ উল্লাস আক্ষেপের প্রত্যেকটি ধ্বনি তাঁর অতি পরিচিত। টেনব্রুকের চোয়াল দু'টো রুদ্ধ উত্তেজনায় নিঃশব্দে কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন টেনব্রুক। পরিশ্রান্ত গানের সুরটা যেন এপাড়া ওপাড়া এলোপাথাড়ি দৌড়ে চলে যাচ্ছে। মাঠের কাছাকাছি গিয়ে গানটা আর একবার বিজয় প্রসাদের মত উদ্দাম হয়ে উঠলো। তারপরেই আকস্মিক একটা বিরাম। কিছুই শোনা যায় না। অনেকক্ষণ পরে আবার গুমরে উঠলো একেবারে অন্যদিকে। বোধহয় পশ্চিমের ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে রেললাইন ডিঙিয়ে দর্জিপাড়ার দিকে ছুটে চলেছে। চটুলে ঘূর্ণি বাতাসের মত গানটা যেন উড়ে যাচ্ছে।

গল্প আছে, আওরঙজেব অক্ষয় বটের শেকড় তুলে ফেলে তাতে গরম সীসা ঢেলে দিয়েছিলেন যেন ভবিষ্যতে কোনদিন আর চারা গজিয়ে না ওঠে। একেই বোধহয় আমূল চিকিৎসা বলে।

টেনব্রুক বোধহয় গল্পটা জানতেন। বিকালে বিদ্যাপিঠের ছুটির পর ছাত্রেরা কেউ বাড়ী যেতে পারেনি। স্বয়ং টেনব্রুক উপস্থিত থেকে ছাত্রদের একটা শোভাযাত্রা রওনা করিয়ে দিলেন। রাত দশটা পর্যন্ত শহরের সর্ব্বত্র এই শোভাযাত্রা ঘুরবে। ফিরে বিদ্যাপিঠে এসেই শেষ হবে, তারপর খাওয়া দাওয়া হবে। টেনব্রুক জিলিপি কেনবার জন্য দশটি টাকা দিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

প্রায় একশো ছাত্রের পুরোভাগে অগ্রনায়কের মত একটু এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল বলাই। তাকেই শোভাযাত্রা চালিয়ে আর গাইয়ে নিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়েছে। টেনব্রুক সাহেবের নির্দ্দেশ।

বলাইয়ের মাথাটা সামনের দিকে ভাঙা গাছের মত ঝুঁকেছিল। মাটির দিকে একটা উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি নিয়ে দেখছিল বলাই। ওর সমস্ত দুরন্তপনা এক চরম অপমানের আঘাতে যেন অসাড় হয়ে গেছে। আসন্ন মূর্ছার সময় রোগীকে যেন জোর করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

গানটা টেনব্রুকের রচনা। নাম্‌তা পড়াবার ভঙ্গীতে বলাই সুর করে গানের প্রথম পদটি গাইলো—আমি যীশুর ছোট মেষ।

শোভাযাত্রী ছেলেরা বিষণ্ণ পাখির ঝাঁকের মত কিচির মিচির করে ধুয়া ধরে গাইলো—আমি যীশুর ছোট মেষ।

যেন জিভে কামড় পড়েছে, বলাই হঠাৎ আরও জোরে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

—প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ—

ছেলেদের দল প্রতিধ্বনি করলো।—প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ।

শোভাযাত্রা রওনা হলো। হিতৈষী অভিভাবকের মত মনের স্নেহ মনে গোপন রেখে, শাসনের দোর্দণ্ড বিগ্রহের ভঙ্গীতে যেন টেনব্রুক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন, তারপর বাংলোয় চলে গেলেন। তিনি জানতেন রাত্রি দশটা পর্যন্ত এইভাবে সুপথে চলে চলে ছেলেগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, বিপথে যাবার উৎসাহও নিভে যাবে। তা'ছাড়া দশটাকার ঘুমপাড়ানী মিষ্টির ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। আর ভাবনা নেই। টেনব্রুক নিশ্চিন্ত হলেন।

সন্ধ্যে হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারখানা টেবিলের ওপর রাখা ছিল। ইণ্ডোলজিস্ট টেনব্রুক আজ সেখপুরার প্রত্নরহস্যের বুক চিরে খানাতল্লাসী করলেন। ঐ প্রতিহিংসা পরায়ণ কিম্বদন্তীটা ভয়াবহ ব্যাধির মত সারা সেখপুরার নাগরিক বুদ্ধি বিষাক্ত করে তুলেছে। এর পিছনে কোন সত্যের ভিত্তি আছে কি?

গেজেটিয়ার হাতড়ে হাতড়ে টেনব্রুক এক জায়গায় এসে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। সত্যিই যে লেখা আছে ছাপার অক্ষরে—ডুমরিচকের ডাকবাংলো থেকে এগার মাইল দূরে যে বিপুল গাছের তলায় স্থানীয় দ্রাঘিমারেখার পরিচয় লেখা আছে, সেখানে একদিন কোম্পানীর ফৌজের কামানের বেদী ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলে, মিউটিনির সময় ঐখানে সেপাই বন্দীদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

প্রত্নতত্ব বিভাগের কোন্ গবেট সার্ভেয়ার এই ষাঁড়-মোরগ গল্পটি সরকারী গ্রন্থের পাতায় ফেঁদে গেছেন! মিষ্টার টেনব্রুক মনে মনে সেই মূঢ় পণ্ডিতের বুদ্ধিকে লিঞ্চ করলেন। ধিক্কার দিলেন—এইসব রন্ধ্র দিয়েই একদিন শনি ঢোকে এবং হয়েছেও তাই। জন কোম্পানীর বেনেবুদ্ধি দিয়ে বিংশ শতাব্দীর কলোনী শাসন চলে না। চাই আমূল চিকিৎসা। ইণ্ডোলজিস্ট টেনব্রুক তাঁর প্রতিভার ছুরিকে দু'ঘণ্টা ভেবে ভেবে শানিয়ে নিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন করে প্যারা লিখলেন টেনব্রুক।—'ডুমরিচক ডাকবাংলো থেকে এগার মাইল দূরে, নদীর ধারে, পিপুলগাছের তলায় যেখানে দ্রাঘিমা রেখার পরিচয় লেখা রয়েছে, সেখানে (প্রথম পৌরাণিক যুগে—খৃষ্ট মৃত্যুর পরে পঞ্চম শতকে) ব্রহ্মদত্ত নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল.....।

হঠাৎ একবার কলম থামালেন টেনব্রুক। ভাবতে ভাবতে ভুরু দুটো কেঁচোর মত পাকিয়ে উঠলো। কদর্য্য একটা কুহক যেন ছোট ছায়ামূর্তি ধরে তার দৃষ্টিপথ জুড়ে নেচে বেড়াচ্ছে। এই মূর্তিটাকে চিনতে পারা যায়—গান্ধী গান্ধী গান্ধী। সবাই তাকে বলে গান্ধী। কে এই গান্ধী? এই অশান্ত অবাধ্য দুষ্টু ফকির গান্ধী? কী ভেবেছে সে?

দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত করে কলমটা আবার তুলে ধরলেন টেনব্রুক। যেন একটা প্রেরণার আবেশে লিখে ফেললেন।—'এক দুর্দান্ত পাপী কিরাতের দৌরাত্ম্যে রাজ্যের সুখ ও শান্তি নষ্ট হতে বসেছিল। ক্ষত্রিয় রাজা দেবপ্রিয়োর সেবায় প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে ঋষি ব্রহ্মদত্ত সেই কিরাতকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলেন।'

টাইপ রাইটার মেসিনটাকে সাগ্রহে বুকের কাছে টেনে নিলেন টেনব্রুক। নতুন একটি কাগজের স্লিপের ওপর এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে টাইপ করে সাজালেন। পুরনো প্যারাগ্রাফের ওপর খাপে খাপে মিলিয়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেন। চেপে চেপে বসিয়ে দিলেন, চার পাশ থেকে দেখলেন, যেন কোথাও কোন ফাঁক না থাকে।

এই সামান্য কাজটুকু করতেই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন টেনব্রুক। ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। একটা বাচাল ঝর্ণার মুখে যেন পাথর চাপা দিচ্ছেন। আশ্বস্ত হলেন। আর কোন ফাঁক নেই।

বাকী রইল আজকের রাতটা। তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। এক পেয়ালা কফি খেয়ে পরিশ্রান্ত টেনব্রুক ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ পাইচারী করে নিলেন। তারপর ল্যাম্পের ওপর নীলকাঁচের ঘেরাটোপ টেনে নিয়ে পড়তে বসলেন। সার্থক আনন্দের আরামের সোফার ওপর শরীর এলিয়ে দিলেন।

বাইরের শব্দহীন অন্ধকারটা তখন জমাট বেঁধে গেছে, একটা শোকাচ্ছন্ন রাত্রির হৃদপিণ্ডের মত। আমবাগানের ভেতর দিয়ে ছাত্রদের শোভাযাত্রা ফিরছে এতক্ষণে। একশত ক্লান্ত ভাঙা-গলার একটা বিকৃত গানের শব্দ আসছে। ঠিক শব্দ নয়—শব্দের রুষ্ট নিঃশ্বাস। একটা আহত সর্পযুথ যেন বিষদাঁত নতুন করে ঘসে নেবার জন্য আড়াল দিয়ে সরে পড়ছে।

হঠাৎ শিউরে উঠলেন টেনব্রুক। ভারতের আত্মার ছবিটা টেনব্রুকের মনের ভেতর হঠাৎ খোলা হয়ে গেল—

কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরধবল চূড়ার মত নয়, বলাইয়ের মুখটার মত বর্ণচোরা হিংসুক ও ভীরু।

টেনব্রুক খোলা জানালাটার দিকে উদভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। একটা নিষ্ঠুর নৈরাশ্য চিন্তা শিরায় শিরায় শিউরে উঠতে লাগলো।—না, ওরা মানবে না। আবার ওরা আসবে। আজই রাত্রিশেষে সেই বায়ুভূত নিরালম্ব ছোট ছোট মসীমূর্ত্তি—শয়তানী আনন্দে অপমৃত্যুর কোরাস গাইতে গাইতে আবার আসবে—দল বেঁধে—কাতারে কাতারে।

BANGLADARSHAN.COM

রাজগীরের ধূপদানের বুকটা তখন প্রবলভাবে পুড়ে চলেছে। কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়া জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে অবলীল স্বচ্ছন্দ্যে বাইরে উড়ে যাচ্ছে। টেনব্রুকের মাথার ভেতর একটা বোবা বিভীষিকা ছটপট করতে লাগলো।

অসহ উদ্বেগে টেনব্রুক টেবিলের ওপর ঘণ্টি ঠুকতে লাগলেন। বেয়ারাটা তন্দ্রা ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে ডাকলো—হুজুর।

টেনব্রুকের সারা মুখে একটা রক্তাভ জ্বালার দীপ্তি। মাত্রা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিক রকম স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—জলদি দৌড়ে যাও, ডি-এস-পি সাহেবকে সেলাম দাও। সুবেদার মেজরকে বোলাও। জলদি কর। আজ রাত্রে ইষ্টার্ণ রাইফেলস্ ঘুমোতে পারবে না। শহরটাকে কর্ডন দিতে হবে। সমস্ত রাত পাহারা দিতে হবে। শিকারীর মত তাড়া করে আজ ওদের ধরে ফেলতে হবে। চরম শিক্ষা শিখিয়ে দিতে হবে আজ।

ডেমোক্রেসীর এই সঙ্কটের শেষ ঘটনা হলো সম্রাট বনাম বলাইয়ের মোকদ্দমা। তার বিবরণ জানবার উপায় নেই। কে ঢুকবে আদালত এলাকায়? যে-ভয়ানক লাঠি আর লালপাগড়ীর আস্ফালন। বন্দীবাহী মোটর লরিটা থেকে নামবার সময় দূর থেকে বলাইকে চকিতে একটুখানি দেখতে পাওয়া যায়। মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কোমরে

দড়ি, হাতে হাতকড়া। ডি-এস-পি জানকী প্রসাদের মূর্তিটাই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। আদালতের উঁচু বারান্দার ওপর টান হয়ে দাঁড়িয়ে বেল্টের ওপর হাত বোলান, কপালের ওপর মোটা মোটা শিরাগুলি অশান্ত গর্বে দপ্ দপ্ করে ফুলে ওঠে, আর ফটকের বাইরে ভীড়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গর্জন করে ওঠেন—ডিসপার্স।

তারপরেই ফটকের পুলিশ পিকেটের দিকে তাকিয়ে থাবা তুলে অর্ডার হাঁকেন—চার্জ!

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM